মহান মে দিবস

আজ মহান মে দিবস। বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সংহতির দিন। ১৮৮৬ সালের এইদিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোসহ বড় বড় শহরে শ্রমিকরা দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ ও শ্রমের ন্যায্য মজুরির দাবিতে সর্বাত্মক ধর্মঘট শুরু করেন। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা মালিকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে মিছিল-সমাবেশ করেন। এর আগে শ্রমিকদের সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করতে হতো। দৈনিক ১৪-১৮ ঘণ্টা শ্রম দেয়ার পরও শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হতো। শ্রমিকের তিল তিল শ্রমের ওপর ভিত্তি করে সভ্যতা গড়ে উঠলেও, শ্রমিকরা বরাবরই ছিল উপেক্ষিত। এমনকি শ্রমিকদের নির্দিষ্ট কোন ছুটির দিনও ছিল না। শোষণ-বঞ্চনার প্রতিবাদে শ্রমিকরা ১৮৮৬ সালের ১ মে থেকে যে আন্দোলনের সূচনা করে তা চূড়ানত্ম পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় ৩ ও ৪ মে'তে। শিকাগো শহরের ওই শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশের বেপরোয়া গুলিতে কমপক্ষে ১০ শ্রমিক নিহত এবং বহু আহত হন। অনেক শ্রমিক নেতাকে গ্রেফতার করে দিনের পর দিন আটক করে রাখা হয়। গ্রেফতারকৃত শ্রমিকদের মধ্যে ৭ জনকে মৃত্যুদ-দ-িত করা হয়। শ্রমিক আন্দোলনের এই অধ্যায়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য দ্বিতীয় আনত্মর্জাতিক প্যারিস কংগ্রেসের সিদ্ধানত্ম অনুযায়ী ১৮৯০ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে মে দিবস পালিত হয়ে আসছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে মে দিবস উদযাপিত হচ্ছে।

শ্রমিকদের বঞ্চনার ইতিহাস নতুন নয়। সব যুগে সব সমাজে এটি ছিল। শ্রমিকদের ঘামে মালিকদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈরি হলেও, অনেক শ্রমিককে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাতে হয়। দিন-রাত শ্রম দিয়েও জীবনের ন্যূনতম চাহিদা তারা পূরণ করতে পারেন না। অনেক সময় শ্রমিক তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য পথে নামতে বাধ্য হন। আমাদের দেশেও যথাযোগ্য মর্যাদা ও গুরম্নত্বসহকারে এই দিবসটি পালিত হয়। শ্রমিক কল্যাণে আমাদের দেশে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ সুনিশ্চিত হয়েছে তা বলা যাবে না। গার্মেন্টস শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য বেতন ও সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য রাসত্মায় নামেন। সেখানে ছোটখাটো সহিংস ঘটনাও ঘটে। শুধু গার্মেন্টস শ্রমিক নয়, এর আগে নৌ ও বন্দর শ্রমিকরাও ন্যায্য মজুরির জন্য পথে নামেন।

দেশের রফতানিমুখী পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের বঞ্চনার ইতিহাস নতুন নয়। দৈনিক ১২-১৪ ঘণ্টা কাজ করে অনেক শ্রমিকই ন্যায্য মজুরি পান না। তার ওপর বেতন বকেয়া, কথায় কথায় শ্রমিক ছাঁটাই, লকআউট ইত্যাদি কারণেও শ্রমিকদের দুঃখ, দুর্দশার অনত্ম থাকে না। আবার অনেক ফ্যাক্টরির কাজের পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত নয়। বিভিন্ন সময় দেখা গেছে, পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা না থাকার দরম্নন, অনেক শ্রমিককে দুর্ঘটনায় প্রাণ দিতে হয়েছে। দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য কারখানাগুলোতে আলাদা সিঁড়ি থাকার কথা থাকলেও কোন কোন কারখানায় তা নেই। চা, চামড়া, পাটসহ অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকদের চিত্রও প্রায় একই। একটা কথা সকলকে স্মরণ রাখতে হবে, শ্রমিক স্বার্থ সংরৰণ ব্যতীত যেমন শিল্পের বিকাশ সম্ভব নয়, তেমনি অহেতুক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বা শিল্পের ক্ষতি সাধন শ্রমিকদের ভাগ্য বিড়ম্বনাই বাড়াবে।

মে দিবস ও বাংলাদেশের শ্রমিক সমাজ

মুহম্মদ আলতাফ হোসেন

১৮৮৬ সালের হে মার্কেটের রক্তাক্ত অধ্যায়ের পথ ধরে বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের অর্জনকে উদযাপন করার জন্য ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন করা হয়। দুটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এক, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায় রাস্তায় না নামলে হয় না এবং শ্রমিকের রক্ত না ঝরলে মালিক ও শাসক পক্ষের টনক নড়ে না। বাংলাদেশের বিদ্যমান বাস্তবতায় যখন একজন শ্রমিক ন্যূনতম জীবনযাপন করতেও ব্যর্থ হয়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়, তখন মালিক পক্ষ ও শাসক গোষ্ঠীর কাছে তা ষড়যন্ত্র বলে মনে হয়। শিকাগো এবং ইলিনয়সেও শাসক গোষ্ঠী ও মালিক পক্ষের তাই মনে হয়েছিল। সেখানে আট ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবি উপেক্ষা করায় শ্রমিক যখন রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়, তখন তা বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী বলে চিহ্নিত হয়। আট ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবি যখন অযৌক্তিক মনে হয়, তখন তা অগ্রাহ্য করা হয়। এরপর যখন ধর্মঘট ডাকা হয়, তখন তা প্রচলিত আইনে অবৈধ বলে বিবেচিত হয় এবং একটি উস্কানিমূলক ঘটনার সূত্র ধরে শ্রমিকদের ওপর গুলি চালানো হয়। পরের দিন যখন প্রতিবাদে র‍্যালি বের করা হয়, তখন অজ্ঞাতনামা একজন পুলিশের ওপর বোমা নিক্ষেপ করে। এরপর রায়টে পুলিশসহ ১২ জন নিহত হয়।

পরবর্তী সময়ে প্রকাশ্য বিচারে আটজনকে বিচার করে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া হয়। আমাদের জন্য মে দিবসের শিক্ষা হল, আমরা ১৩৪ বছর আগের তিমিরেই রয়ে গেছি। ন্যূনতম মজুরি আদায়ের জন্য রক্ত ঝরছে এবং আরও ঝরবে বলে মনে হয়। শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমাদের কী আরও এক শতক অপেক্ষা করতে হবে? দুই, শ্রমিকের অধিকার আদায়ের অর্জনকে উদযাপন করতে মে দিবস পালিত হয়। আমরা যে মে দিবস পালন করি, আমাদের অর্জন কী? সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক 'মানুষ' হিসেবে বেঁচে থাকার মতো মজুরি পায় না। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকের নিয়োগপত্র নেই। মে দিবসের চেতনাকে চিরস্থায়ীভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আট ঘণ্টার বেশি শ্রম দিতে বাধ্য করা হয় (কেননা ওভারটাইম না করলে প্রাপ্ত বেতনে পশুর জীবন অর্থাৎ শুধু খাবার সংস্থানও হয় না)। যখন তখন বরখাস্ত করা হয়। নারী শ্রমিকদের ওপর যৌন নির্যাতন প্রতিকার পায় না। শ্রম আইন পালনে মালিক পক্ষের অপারগতা সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা হয়। সরকার অসহায়ের মতো মালিক পক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। যারা শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করবে, সেই ট্রেড ইউনিয়ন সফল চরিত্র হননে শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষায় অক্ষম। তাহলে আমরা কি শ্রমিকের অধিকার আদায়ের অর্জনকে উদযাপন করার যোগ্য?

স্বাধীনতা যুদ্ধের পথে বাংলাদেশের যাত্রার অন্যতম নিয়ামক ছিল পাকিস্তান আমলে শ্রমজীবী মানুষের বঞ্চনা। বলা হয়েছিল, স্বাধীন দেশে সাধারণ মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। স্বাধীনতার পর কলকারখানাগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল। আশা ছিল, শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়িত হবে– ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে তারা যেভাবে শোষিত হচ্ছিল, তা থেকে মুক্তি পাবে। মুক্তি অর্জন হয়নি, বরং পরিস্থিতি আরও হতাশাজনক। স্বাধীনতার আগে ও পরে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করত এবং সেখানে প্রকৃত শ্রমিকরাই নেতৃত্ব দিত। এখন দেখি ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি সাধারণ শ্রমিকদেরও আস্থা নেই। অনেক ক্ষেত্রে আবার ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নেই। বেসরকারি খাতে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার থাকলেও সে সুযোগ খুব একটা দেয়া হয় না; বরং যাও আছে তা শ্রমিক–বিচ্ছিন্ন। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার চেয়ে ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়, ক্ষুদ্র গোষ্ঠী স্বার্থ রক্ষা বা সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতেই তারা বেশি ব্যস্ত।

শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির ক্ষেত্রে নতুন প্রতিশব্দ চালু হয়েছে, যার নাম লিভিং ওয়েজ বা সাধারণভাবে টিকে থাকার জন্য যতটুকু মজুরি দরকার সেটুকু। লিভিং ওয়েজ প্রতিষ্ঠার কথা যারা বলেন, আসলে তারা শ্রমিকদের মানুষ মনে করেন না। তারা আট ঘণ্টার শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনে যতটুকু অর্থ দরকার শুধু সেটুকু দিতে রাজি, এর বেশি নয়। এতে শিক্ষা, বিনোদন, সম্মানজনক বস্ত্র পরিধান বা নাগরিক হিসেবে তাদের অবদানের বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হয় না। বিগত সরকারের আমলে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে মজুরি কমিশনও গঠিত হয়। ওই সময় আমাদের হিসাব ছিল, ন্যূনতম মজুরি কোনভাবেই পাঁচ হাজার টাকার নিচে হওয়া উচিত নয়। এটি ছয় বছর আগের কথা। পরবর্তী সময়ে সর্বনিম্ন মজুরি ঠিক করা হয় এক

হাজার নয়শ' টাকা। মানে প্রতিদিন প্রায় ৬৫ টাকার মতো। ৬৫ টাকা দিয়ে একজন মানুষ শুধু কি তার খাদ্যচাহিদাও পূর্ণভাবে মেটাতে সক্ষম? যারা এ ধরনের মজুরি নির্ধারণ করলেন, তাদের আমি ন্যূনতম বিবেচনা বোধসম্পন্ন মানুষ বলতেও রাজি নই।

এখন দাবি উঠেছে, শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি পাঁচ হাজার টাকা নির্ধারণের, অর্থাৎ দিনে ১২০ টাকার মতো। গত চার বছরে দেশে ভয়াবহ মূল্যস্ফীতি ঘটে গেছে। ২০০৬ সালে ৬৫ টাকা দিয়ে যে পরিমাণ পণ্যসামগ্রী কেনা যেত, এখন ১৭০ টাকা দিয়েও তা সম্ভব নয়। এ মূল্যস্ফীতির ফলে বাংলাদেশের একটি বড় অংশ যারা দারিদ্র্যসীমার ওপর উঠে এসেছিল, তারা আবার নিচে নেমে গেছে। সুতরাং এখন পাঁচ হাজার টাকাকেও আমি বলব এক ধরনের প্রতারণা। শ্রমিকরা যখন বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমে আসে, তখন অপরাধ করছে মনে হয়। মালিকরা তো শ্রমিকদের পশুই মনে করেন, তাই শুধু 'খোরাকি' দেয়াটাকেই যথেষ্ট মনে করেন। কোন পশুকে দিনের পর দিন অনাহারে রাখলে সে হিংস্র হয়ে উঠতে বাধ্য। একজন মানুষকে আট ঘণ্টার জায়গায় ১২ ঘণ্টা খাটাবেন আর এমন মজুরি দেবেন যা দিয়ে তার বেঁচে থাকাই কষ্টকর; সেক্ষেত্রে সে হিংস্র হয়ে উঠতে বাধ্য। মালিক পক্ষ তাদের এ পথে ধাবিত করছে। যখন মজুরি বাড়ানোর কথা আসে, তখনই বলা হয় মজুরি বাড়ালে শিল্প ধ্বংস হবে। আমাদের মাথাপিছু গড় মজুরি (গার্মেন্টস খাতে) চীনের এক-তৃতীয়াংশ। ভারতে শ্রমিকের গড় মজুরি দৈনিক ১৫০ রুপি আর বাংলাদেশে ৫০ রুপি। উদ্যোক্তারা যখন দরকষাকষি করেন, তখন তাদের নজর যায় কেবল শ্রমিকের মজুরি কমানোর দিকে।

শ্রমিক অসন্তোষের ভয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান ট্রেড ইউনিয়ন করতে দিতে চায় না। ট্রেড ইউনিয়ন থাকলেই বরং এ ঝুঁকি কমে যায়। নির্দিষ্ট নেতৃত্ব থাকলে আলোচনা বা সমঝোতার মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। অবশ্য তার জন্য দরকার সদিচ্ছা। এক্ষেত্রে শুধু নিশ্চিত করতে হবে, যেন মালিক পক্ষের মনোনীত কেউ না হয়ে তারা প্রকৃত শ্রমিকদের মধ্য থেকেই হন। এছাড়া সিবিএ (কালেক্টিভ বারগেইনিং এজেন্সি) গঠন করলে যে কোন উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সহজে এড়ানো যায়। যেসব কারখানায় ইতিমধ্যে শ্রমিক কমিটি গঠিত হয়েছে, সেখানে সহিংসতা অনেক কম।
গার্মেন্টস শিল্পে শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে আইএলওসহ বিভিন্ন সংস্থার কড়া নজরদারির কারণে। কৃষি, নির্মাণ, হালকা যন্ত্রপাতিসহ বিভিন্ন শিল্পে প্রায় ১ কোটি নারী ও শিশুশ্রমিক জড়িত। নির্মাণ শিল্পের বড় অংশ নারী শ্রমিক। চামড়া শিল্পে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা সর্বাধিক। অন্যান্য খাতেও তাদের অবস্থা ভালো নয়। কিছু খাত অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সরকার এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আইনের অভাব আমাদের দেশে নেই, কিন্তু সেগুলোর প্রয়োগ নেই। শ্রমিকদের জীবনেও মৌলিক কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। নারী শ্রমিকরা পুরুষ শ্রমিকদের সরাসরি অর্ধেক মজুরি পান। কৃষিতে মেয়েরা বিনামূল্যে শ্রম দেয়। নারীকে কৃষি শ্রমিক বা কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় না। অবশ্য যেখানে আইন থাকার পরও কার্যকর হচ্ছে না, সেখানে নতুন আইন করে কী লাভ?

অর্থনীতিতে বড় এক কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্যে আমরা রয়েছি। বিশ্বব্যাপী চাহিদা বাড়ার কারণে খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য স্বনির্ভর কৃষি দরকার, যেন মৌলিক খাদ্য চাহিদা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে মেটাতে পারি। বাংলাদেশে যে ধরনের শিল্প বিকাশ হচ্ছে, তা দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিধ্বংসী। ধরা যাক, একটি ডাইং বা চামড়ার কারখানা স্থাপিত হচ্ছে। সেখান থেকে যে মুনাফা অর্জন হবে বা যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, তার সঙ্গে যদি ওখান থেকে কত ধরনের দুষণ হবে বা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ক্ষয় হবে, এসব বিবেচনায় আনা যায় তবে দেখা যাবে ক্ষতির পরিমাণ মুনাফার চেয়ে বেশি। আবার অনেক ক্ষতিই চিরস্থায়ী বা পুষিয়ে নেয়া যাবে না। সুতরাং এ ধরনের শিল্পভিত্তিক বিকাশ আমাদের জন্য আত্মঘাতী। আমাদের আবাদি জমিগুলো দখল হয়ে যাচ্ছে, জমি দুষিত হয়ে পড়ছে, খাদ্যচক্রে বিষ ঢুকে পড়ছে। আমাদের কৃষি জমিগুলো রক্ষা করতে হবে এবং উৎপাদন বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কৌশল কৃষি ও সেবাখাতভিত্তিক হতে হবে। আমাদের অর্থনীতির দিকপালরা শুধু শিল্প ও কৃষি নিয়ে মাথা ঘামান। বর্তমানে রাজস্ব আয়ের আনুমানিক ৬০ ভাগ আসে সেবা খাত (নির্মাণ খাতসহ) থেকে। বাকি ৪০ ভাগ কৃষি ও কলকারখানাভিত্তিক শিল্প থেকে। সেবা খাত থেকেই জিডিপির সিংহভাগ আয় হতে পারে। নতুন কলকারখানা প্রতিষ্ঠার অনুমোদন না দেয়া বা পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলা শিল্প বন্ধ করা যেতে পারে। তখন আমরা যে আমদানিনির্ভর হয়ে পড়ব, তা নয়। সেবাভিত্তিক দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে পারলে

শ্রম রফতানির মাধ্যমেও জাতীয় আয় বাড়ানো যাবে। দেশে দক্ষ মানবসম্পদের দারুণ ঘাটতি রয়েছে। আমাদের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের যে বিকাশ হচ্ছে না, তার অন্যতম কারণ দক্ষ মানবসম্পদের অভাব। কর্মসংস্থান, শ্রম ব্যবস্থাপনা ও প্রবৃদ্ধি বিবেচনা করে জাতীয় অর্থনীতিতে একটি মৌলিক পরিবর্তন আনা দরকার। সেবা খাতভিত্তিক অর্থনীতি পরিবেশবান্ধব করাও সহজ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর থেকে অর্থমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী সবাই গর্ব করেন আমাদের রেমিটেন্স ১০ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে বলে। এ কারণে সামগ্রিক অর্থনীতিতে এক ধরনের স্থিতিশীলতা আছে। কিন্তু প্রবাসী শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় আগের সরকারগুলোর মতো বর্তমান সরকারও ব্যর্থ। মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয় নাগরিকদের যদি কোন সমস্যা হয়, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে ভারতীয় দুতাবাস সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। আমাদের যে দুতাবাসগুলো আছে, তাতে প্রথম সমস্যা জনবল কম। তারা আন্তরিকও নয়। মজার ব্যাপার, দেশে শ্রমিককে নায্য মজুরি না দিলে বিদেশেও মালিকরা সাহস পায় শ্রম শোষণের। এরকম মানবিক বিপর্যয় মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, কুয়েত ও কাতারে ইতিমধ্যে ঘটেছে। শ্রমিকের সংখ্যানুপাতে দুতাবাসে জনবল নিয়োগ করা দরকার, যাতে তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি হয়। এক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি দারুণ কাজ করতে পারে, যেন দুতাবাসে না এসেই মোবাইল বা ইমেইলে শ্রমিকরা তাদের সমস্যার কথা জানাতে পারে।

এতে তথ্য-উপাত্ত সহজে সংরক্ষণও করা যাবে। ফিলিপাইন, নেপাল বা শ্রীলংকা থেকে যে ধরনের দক্ষ শ্রমিক বিদেশ যায়, তারা যে পরিমাণ আয় করে, বাংলাদেশের শ্রমিকরা তার এক-তৃতীয়াংশ আয় করে মধ্যপ্রাচ্যে। অথচ সেখানে জনসংখ্যার দিক থেকে আমরা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে দরকার ভোকেশনাল শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানো। তাহলে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে আমরা মুক্তি পাব। মধ্য আয়ের দেশ গড়ার যে স্বপ্ন আমরা দেখি, তা গড় আয় দিয়ে হবে না সবার আয় বাড়াতে হবে। বিশেষ করে যারা কম আয়ের মানুষ বা অতিদরিদ্র। তাদের অবস্থা তাহলে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে চলে আসবে। এতে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর ব্যবধানও কমে আসবে।

এ সরকারের ইতিবাচক কাজের মধ্যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অন্যতম। কিন্তু এতে মধ্যপ্রাচ্যে আমরা বাজার হারাচ্ছি। মন্ত্রী যদিও বলেছেন, বিশ্বমন্দার কারণে জনশক্তি রফতানি কমে গেছে; কিন্তু আমিরাতের মতো সৌদি আরব তো এ মন্দায় খুব বেশি আক্রান্ত হয়নি। প্রতি বছর দুই লাখ লোক সেখানে যাচ্ছিল। তা থেমে যাওয়ায় এখন দেশের মধ্যেই কর্মসংস্থান জোগাতে হবে। না হলে এ বেকাররা নানা ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়বে। সেখানে বিভিন্ন পক্ষ সুযোগ নিতে পারে।

ঠিক করতে হবে, আমরা কী কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়তে চাই নাকি নয়া উদারবাদী শোষণমূলক রাষ্ট্র গড়তে চাই। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের একটি পূর্বশর্ত হল মালিকানা ব্যবস্থায় শ্রমিক-কর্মচারীর অংশগ্রহণ। মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক, সিদ্ধান্ত গ্রহণে শ্রমিকের অংশগ্রহণ, মুনাফা অর্জন ও বণ্টনে শ্রমিকের অংশগ্রহণ কল্যাণমূলক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হতে পারে। পশ্চিম ইউরোপসহ স্ক্যানডিনেভিয়ান অনেক দেশেই এ কল্যাণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে।
পৃথিবীর অগ্রযাত্রার ইতিহাস রাজা-রানীর ইতিহাস নয়, শ্রমজীবী মানুষের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে গড়ে তোলা প্রাচুর্যের ইতিহাস। এই প্রাচুর্যের বণ্টন যদি সুষম না হয়, তাহলে বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষের বিক্ষোভে সবাই ভেসে যাবে। সামগ্রিকভাবে শ্রমিকদের বঞ্চনার প্রতিকার করুণার জায়গা থেকে সম্ভব নয়, সম্মানের জায়গা থেকেই তা করতে হবে।

মহান মে দিবস

শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম আর সংহতির দিন মহান মে দিবস আজ। শ্রমকে ভিত্তি করে সভ্যতার সূচনা হলেও শ্রমিকের মর্যাদা আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ওই সময় তাদের নির্দিষ্ট কোন কর্মঘণ্টা ছিল না। নামমাত্র মজুরিতে শ্রমিকরা মালিকের ইচ্ছামতো কাজ করতে বাধ্য হতেন। ১৮৮৬ সালের ৩ মে হে মার্কেটে আহূত ধর্মঘটী শ্রমিক সমাবেশে পুলিশের হামলায় ছয়জন শ্রমিক নিহত হন। এর প্রতিবাদে ৪ মে হাজার হাজার শ্রমিক ফেটে পড়েন বিক্ষোভে। সেদিনও পুলিশের গুলিবর্ষণে পাঁচজন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেন। আন্দোলন

গড়ে তোলার অপরাধে কয়েকজন শ্রমিককে মৃত্যুদÉও দেয়া হয়। এভাবে প্রাণের বিনিময়ে শ্রমিক শ্রেণী কায়েম করে দৈনিক ৮ ঘণ্টা শ্রমের অধিকার। ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে 'পহেলা মে' আন্তর্জাতিক শ্রমিক ঐক্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নির্দিষ্ট শ্রমঘণ্টার সঙ্গে বেতন বৈষম্য, ন্যূনতম মজুরি, নিয়োগপত্র প্রদানের মতো বিষয়ও আজ শ্রমিকদের জোরালো দাবিতে পরিণত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ট্রেড ইউনিয়নগুলোও শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

উন্নত দেশে এখন শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি কাজের পরিবেশও হয়েছে যথেষ্ট উন্নত। তবে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে শ্রমজীবীদের দুর্ভোগ ঘোচেনি। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। অথচ স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ জেনেভা কনভেনশনে স্বাক্ষর করে শ্রমজীবীদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। অনেক বেসরকারি শিল্প-কারখানায় আইএলও নির্ধারিত শ্রমঘণ্টাও মানা হয় না। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে একটি 'গণতান্ত্রিক' শ্রমনীতি ও শ্রম আইন তৈরির অঙ্গীকার রয়েছে। এর খসড়া তৈরি হলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা চূড়ান্ত করার কাজ ঝুলে আছে প্রায় দু'বছর ধরে। এটা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে যে ত্রিপক্ষীয় সভা হওয়ার কথা, তা মালিক পক্ষের অনীহার কারণে বারবার পিছিয়ে যাচ্ছে বলে খবর রয়েছে। এমপয়ার্স ফেডারেশনের মতে, শ্রম আইনে সংশোধনী আনার কাজটি হতে হবে ত্রুটিমুক্ত। এক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত কোন ত্রুটি থাকলে তা দ্রুত নিরসনই কাম্য।

দেশে দক্ষ শ্রমিকেরও অভাব রয়েছে। তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি। এটা জনশক্তি রফতানিতেও বিরূপ প্রভাব ফেলছে। আমাদের জনশক্তি আমদানিকারক দেশগুলোয় বেড়ে যাচ্ছে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা। এদিকে দেশে নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের সঙ্গে শ্রমজীবীদের জীবনযাত্রার মানে অবনতি ঘটাচ্ছে। মূল্যস্ফীতি আরও বাড়বে বলেই আশংকা। আন্তর্জাতিক ও সাংবিধানিক আইন অমান্য করে শিশুশ্রমিক নিয়োগ দেয়া বন্ধ হয়নি। কম মজুরির পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রেই নির্যাতনের শিকার হয় এ শ্রমিকরা। নারী শ্রমিকও মজুরি বৈষম্যসহ নানা নির্যাতনের শিকার। তৈরি পোশাক শিল্পের ৭৫ ভাগ শ্রমিক নারী, যারা সবচেয়ে বেশি শ্রম শোষণের শিকার। অথচ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বৃহত্তম খাত হল এ শিল্প। অবকাঠামোগত ত্রুটি ও অব্যবস্থাপনার কারণে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে এ পর্যন্ত অসংখ্য গার্মেন্টস শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছে।

গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষের কারণে অনেকে চাকরি হারিয়েছে। এমন ক্ষেত্রে কতজন আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকে, তা জরিপ করা হয়েছে কী? কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার শিকারও হচ্ছে মূলত শ্রমিকরা। সেক্ষেত্রে তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। নিকট অতীতে খুলনায় কয়েকটি পাটকল বন্ধ হয়ে গেলেও সেগুলোর লোকসানের জন্য দায়ী ব্যক্তিরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছেন। আইন আছে কাগজ-কলমে। তা প্রকৃত অর্থে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করছে না। বিশ্বায়নের যুগে উদারীকরণ নীতিও শ্রমিক স্বার্থে আঘাত হানছে বলে বিভিন্ন মহলের জোরালো বক্তব্য রয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার সংরক্ষণে কী সরকারি, কী বেসরকারি কোন পক্ষই আন্তরিক নয়। মে দিবসের অনুষ্ঠানে কেবল বক্তৃতা-বিবৃতি শোনা যায়। এসব কারণেই শ্রমজীবীদের ভাগ্য আর বদল হয় না। মহান মে দিবসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে সরকার ও সংশিষ্ট সব মহলের উচিত, এসব দিকে নজর দিয়ে মেহনতি মানুষের অধিকার সমুন্নত রাখা।

মে দিবস ও বাংলাদেশে শ্রমিকদের অবস্থা

ব দ রু দ্দী ন উ ম র

প্রাচীনকালে দাস ও বর্ণপ্রথার শৃংখলে মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে তাদের শ্রমের ফসল অপহরণ করে ক্ষমতাশালীরা নিজেদের ধন-সম্পদ অর্জন করত। এই ক্ষমতাশালীরাই তখন ছিল শোষক শ্রেণী, যারা সমাজ শাসন করত। পরবর্তী সময়ে নতুন কায়দায় কৃষক ও কারিগরদের, প্রধানত কৃষকদের শোষণ করে জমিদাররা ধন-সম্পদের মালিক হতো। শাসন ক্ষমতাও থাকত তাদের হাতে। আধুনিক শিল্প যুগে শোষণ বন্ধ হয়নি। কায়দা পরিবর্তন করে তা নতুনভাবে চলছে। শিল্প-কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকরা যা উৎপাদন করেন তাও একটা অংশ

অপহরণ করে শিল্প পুঁজি মালিকরা। নির্দিষ্ট মজুরির বিপরীতে তারা শ্রমিকদের যত বেশি খাটাতে পারে তত বেশি উদ্বৃত্ত তাদের হাতে আসে। এ জন্য তারা সব সময় চেষ্টা করে শ্রমিকের দৈনিক শ্রম সময় যতটা সম্ভব বেশি রাখতে। একই মজুরিতে শ্রম সময় কম-বেশির ওপর নির্ভর করে শোষণের হার। শ্রম সময় বেশি হলে শ্রমিকের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত বেশি পরিমাণে আসে মালিকের হাতে। শ্রম সময় কমিয়ে আনলে এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমে অর্থাৎ শোষণের হারও কমে। শ্রমিকের থেকে অপহৃত উদ্বৃত্ত বা মুনাফা বেশি করার জন্য মালিকরা চেষ্টা করে শ্রমিকের দৈনিক শ্রম সময় বেশি রাখতে। অন্যদিকে শ্রমিকদের চেষ্টা থাকে শুধু মজুরি বৃদ্ধিই নয়, কাজের সময় বা ঘণ্টা মালিকদের সঙ্গে দরকষাকষি করে যতটা সম্ভব কম রাখতে।

যাকে শিল্প বিপব বলা হয়, তার জন্ম ব্রিটেনে। তারপর আধুনিক শিল্পের বিকাশ ইউরোপে শুরু হয়। সে সময় শ্রমিকদের শোষণ করার জন্য নির্যাতন করা হতো অমানুষিকভাবে। ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস আঠারো শতকের চলিশের দশকে লিখিত ঈড়হফরঃরড়হ ড়ভ ড়ড়ৎশরহম ঈষধংং রহ উহমষধহফ নামে তার বিখ্যাত বইয়ে এই শ্রমিক শোষণ-নির্যাতনের যে নির্মম বাস্তবচিত্র এঁকেছেন তা থেকে দেখা যায়, সে সময় শিশুদেরও ভোর থেকে রাত পর্যন্ত কারখানায় কাজ করতে হতো। তাদের মধ্যে অধিকাংশই অপুষ্টি ও নানা রোগে বিশেষত টাইফাসে মারা যেত। এই পরিস্থিতি সত্ত্বেও শ্রম সময় কমানোর আন্দোলন শুরু হয় ইউরোপের পরিবর্তে আমেরিকায়।

আমেরিকায়ও শ্রমের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল না। সেখানেও সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শ্রমিকদের কাজ করতে হতো পনেরো, ষোল এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে আঠারো ঘণ্টা পর্যন্ত। ১৮২০ থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত আমেরিকার বিভিন্ন শিল্প এলাকায় কাজের সময় কমানোর জন্য ধর্মঘট-আন্দোলন হয়। ১৮৬৬ সালে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন'। এই ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ১৮৬৬ সালের ২০ আগস্ট আয়োজিত সম্মেলনে কাজের সময় কমিয়ে তা নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব পাস হয়। তাতে বলা হয়, 'এই দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে পুঁজিবাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য এই মুহূর্তের প্রথম ও প্রধান কাজ হল এমন একটি আইন পাস করা- যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব রাজ্যেই সাধারণ কাজের দিন হবে আট ঘণ্টা, এই মহান লক্ষ্য পূর্ণ করার পথে সমগ্র শক্তির নিয়োগ করার সংকল্প আমরা গ্রহণ করছি।'

সদ্য সমাপ্ত আমেরিকান গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে দাসপ্রথা বিলুপ্তিতে শ্রমিকদের এই আন্দোলন বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। এ বিষয়ে কার্ল মার্কস ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত তার 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খÊ বলেন, 'ক্রীতদাস প্রথার দরুন মার্কিন প্রজাতন্ত্রের একটি অংশ বিকলাঙ্গ হয়ে থাকায় এতদিন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বতন্ত্র শ্রমিক আন্দোলন একেবারে পঙ্গু হয়ে ছিল। কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক যেখানে ক্রীতদাস, শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক সেখানে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। ক্রীতদাসত্বের সমাধির ওপরই নবজীবনের অভ্যুদয় ঘটে। গৃহযুদ্ধের প্রথম অবদান হল দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের আন্দোলন। অবাধ গতিতে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত, নিউ ইংল্যান্ড থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত।'

১৮৮০ এর দশকে আমেরিকায় 'আট ঘণ্টা শ্রম সমিতি' থেকে নিয়ে আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম সংগঠিত দল সোশ্যালিস্ট লেবার পার্টি আট ঘণ্টা শ্রম সময়ের দাবিতে আন্দোলন জোরদার করে। বামপন্থী শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর কেন্দ্রীয় সংস্থা 'সেন্ট্রাল লেবার ইউনিয়ন' এই দাবিতে ১৮৮৬ সালের ১ মে'র ঠিক আগের রোববার একটি সমাবেশ করে, যাতে উপস্থিত থাকে পঁচিশ হাজার শ্রমিক। এরপর শ্রমিকদের আরও বড় এবং বিশাল এক সমাবেশ শিকাগোতেই হয় ১ মে তারিখে। আট ঘণ্টা শ্রম সময়ের এই দাবিতে আহূত সমাবেশে যোগ দেয়ার জন্য শ্রমিকরা ধর্মঘট করে কারখানা থেকে বের হয়ে আসেন। ১ মে'র সমাবেশে আট ঘণ্টা শ্রম সময়ের দাবি গৃহীত হওয়ার পর ৩ ও ৪ মে সেখানে হে মার্কেট স্কোয়ারে যে সভা হয় তার ওপর পরপর দু'দিন পুলিশ গুলি চালায়। এতে ১০ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়, আহত হন আরও অনেকে। এ থেকেই স্পষ্ট হয়, শ্রমিকরা নিজেদের মজুরি বৃদ্ধি এবং শ্রম সময় কমানোর দাবিতে সংগঠিত হতে থাকলে এর সঙ্গে যুক্ত মালিকশ্রেণী ও তাদের সরকার এই আন্দোলন মোকাবেলা করতে বদ্ধপরিকর হয়।

১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই ফরাসি বিপবের শুরুতে বাস্তিল দুর্গের পতনের শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে নানা দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতারা প্যারিসে সমবেত হন।

এ সম্মেলনে শ্রমিকদের আট ঘণ্টা কর্মদিবস প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সিদ্ধান্ত হয়, প্রতি বছর ১ মে শ্রমিক দিবস হিসেবে উদযাপনের। এই দিবস উদযাপনের তাৎপর্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে ১৮৯০ সালের ১ মে কমিউনিস্ট ইশতেহারের চতুর্থ জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস বলেন, 'এই লাইনগুলো আমি যখন লিখছি, ঠিক তখনই ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণী তাদের সামর্থ্যের হিসাব-নিকাশ করছেন। ইতিহাসে এই প্রথম শ্রমিক শ্রেণী একটি সৈন্যবাহিনী হিসেবে, একই পতাকাতলে একটিমাত্র লক্ষ্য পূরণের জন্য সংগ্রাম করছেন; সেই লক্ষ্য হল, আট ঘণ্টা কাজের দিনকে আইনের স্বীকৃতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করা। ঃ আজ আমরা যে চিত্র প্রত্যক্ষ করছি তা থেকে সমস্ত দেশের পুঁজিবাদী আর জমিদাররা বুঝতে পারবে, সমস্ত দেশের শ্রমিকরা আজ সত্যি সত্যিই ঐক্যবদ্ধ।'

সেই থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি বছর ১ মে সারাবিশ্বে শ্রমিকদের বিভিন্ন সংগঠন দেশে দেশে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করেন। এই সময় আট ঘণ্টা কাজের দাবি সর্বত্র জানানো হলেও শুধু তার মধ্যে দাবি-দাওয়া সীমাবদ্ধ থাকে না। কারণ আট ঘণ্টা শ্রম সময়ই কাজের একমাত্র শর্ত নয়। আরও অনেক ধরনের কাজের শর্ত শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে কার্যকর করার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া শিল্পায়িত উন্নত দেশগুলোতে এখন আট ঘণ্টা কাজের সময় চালু থাকার দাবির কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। শুধু উন্নত দেশগুলোই নয়, অনেক উন্নয়নশীল দেশেও আট ঘণ্টা শ্রম দিবস চালু আছে, বিশেষত সেইসব দেশে রাষ্ট্র পরিচালিত কলকারখানায়। এ কারণে ১ মে'র শ্রমিক দিবস এখন শুধু আট ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবিতেই পালিত হয় না, মজুরি ও কাজের নানা শর্তও মে দিবসের কমসূচির অন্তর্ভুক্ত থাকে।

এটা মনে করা অবশ্য মোটেই ঠিক নয় যে, সব দেশে আট ঘণ্টা শ্রম দিবস এখন চালু হয়েছে। জাতিসংঘের আন্ত র্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (আইএলও) শ্রম দিবস আট ঘণ্টা নির্ধারণ করে দিলেও বাংলাদেশের মতো দেশে এই শ্রম দিবস অনেক ক্ষেত্রেই মেনে চলা হয় না। এটা বিশেষ করে দেখা যায় ব্যক্তি মালিকানাধীন ছোট-বড় কারখানায়। শিশুদেরও খাটানো হয় আট ঘণ্টার বেশি। কাজেই মে দিবসে আট ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবি বাংলাদেশে এখনও প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়।

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, সারাবিশ্বের এবং সেই সঙ্গে আমাদের দেশেও মে দিবস শুধু শ্রমিক সংগঠনগুলোই পালন করে না। মালিকরাও এই দিবস তাদের মতো করে পালন করে। মালিকদের সরকারও মে দিবসে ছুটি দিয়ে থাকে। সরকারিভাবে মে দিবস পালন করা হয়, যাতে মন্ত্রী ও শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন দলের নেতারা সমাবেশে বক্তৃতা করেন। এসব অনুষ্ঠানে সাধারণত শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করতে এবং এভাবে দেশ সেবায় এগিয়ে আসতে!! বাংলাদেশেও প্রতি বছর এটাই দেখা যায়।

বাংলাদেশে শ্রমিকদের শ্রমশক্তি শোষণের হার দুনিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। এখানকার সস্তা শ্রম বিশ্বের পুঁজিবাদীদের জন্যও এক লোভনীয় ব্যাপার। দেশের পুঁজি মালিকরা এই সস্তা শ্রমের সুযোগ নিয়ে নিজেদের মুনাফার হার অস্বাভাবিকভাবে বেশি রাখে। এর ফলে শ্রমিকদের অবস্থা যা হওয়ার তাই হয়। ১ মে শাসক শ্রেণীর মন্ত্রী ও নেতানেত্রীরা মে দিবসে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা ছাড়া এবং সংবাদপত্রগুলো শ্রমিকদের শ্রমদানের সময়কার ছবি বড় করে প্রকাশ সত্ত্বেও এ দেশে শ্রমিকদের দুর্দশার শেষ নেই। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলোও মালিকদের দালাল এবং সে হিসেবে অকার্যকর হয়ে থাকার কারণে এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য কোন শক্তিশালী আন্দোলন নেই, যে আন্দোলন গঠন করা এখন শুধু শ্রমিকদের স্বার্থেই নয়, দেশের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি শক্তিশালীভাবে সংগঠিত করার এক অনিবার্য শর্ত।

মে দিবস, মানবমুক্তি ও বঙ্গবন্ধু

মোঃ ই স রা ফি ল আ ল ম এ ম পি

আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেট চত্বরে ১৮৮৬ সালের ৩ ও ৪ মে মুক্তিকামী নিরস্ত্র শ্রমিকরা তৎকালীন সরকার ও মালিক পক্ষের লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে কালজয়ী আন্দোলনের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করার ভেতর দিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রমিক নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করে

আছেন। বাহ্যিকভাবে এ আন্দোলনের লক্ষ্য শ্রমজীবী মানুষের কর্মঘণ্টা নির্ধারণ, ন্যায্য মজুরি আদায় হলেও এর অন্তর্নিহিত চেতনা ছিল মানবমুক্তির মহোত্তম ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে কারণে মহান মে দিবসের শিক্ষা তথা মর্মবাণী শুধু শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং সময় ও সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে এ আন্দোলনের ইতিহাস মানব সমাজের সার্বিক মক্তির অফুরন্ত প্রেরণার উৎসরূপে আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। বিশ্বের দেশে দেশে, যুগে যুগে পরিচালিত আন্দোলন-সংগ্রাম, যুদ্ধ-বিগ্রহ নানা ধরনের হলেও প্রকৃতপক্ষে এদের চরিত্র কিন্তু দু'ধরনের।

একটি মানবিক বা মানব কল্যাণমুখী, অপরটি দানবিক বা মানবতাবিরোধী। কিন্তু বিজয়ের রাজটিকা সব সময় মানবতার সপক্ষের শিবিরকে অভিষিক্ত করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে। আর এটাই হল বিশ্ব তথা মানব ইতিহাসের আদি ও অকৃত্রিম শিক্ষা। এ শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করতে মানুষের যত ভুল হয় তত অনৈক্য-অশান্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ আমাদের জীবন-সমাজ-রাষ্ট্র তথা বিশ্বব্যবস্থাকে আক্রান্ত ও আচ্ছন্ন করে তোলে। কারণ যে যতই চেষ্টা করুক না কেন, ইতিহাসের রথচক্রকে কখনও স্তব্ধ করা যায় না। ইতিহাস তার আপন ধারায় ছন্দময় গতিতে নির্ধারিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে– লক্ষ্যচ্যুত হবে না।

এখানে মানব সমাজের সৃষ্টিতত্ত্বের একটি অংশের উদ্ধৃতি দেয়া প্রাসঙ্গিক মনে করছি। অন্ধকার থেকে আলো, আলো থেকে আরও আলোকময়তার দিকে এগিয়ে যাওয়াই মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। কারণ মানুষের জীবন ও দেহের মৌলিক উপাদানই হল নুর বা আলো। আর সে কারণেই মানব জাতিকে শোষণ-নির্যাতন ও পরাধীনতার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রাখা যায় না। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত একজন মানুষ তার শাশ্বত মুক্তির সোনালি আলোয় আবগাহন করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। যে কারণে মানুষ শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার অর্থাৎ 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। আর এ জন্যই সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ মানব জাতির সেবা তথা কল্যাণে যারা আত্মনিবেদিত বা আত্মোৎসর্গ করেন, তারা মহামানবের আসনে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকেন। কোন মিথ্যাচার, অপবাদ কিংবা অপপ্রচারের ধুম্রজাল দিয়ে তাদের উজ্জ্বলতাকে ম্লান করা যায় না। মানব জাতির উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতির সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় শ্রম তথা শ্রমিক শব্দটি হল অবিচ্ছেদ্য। এ মানব সভ্যতাকে রক্ষা ও অগ্রসর করার চাকা যতদিন ঘুরবে, শ্রমিক ততদিন সেখানে একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবেই টিকে থাকবে।

মহান মে দিবস বিশেষত শ্রমজীবী মানুষের সত্যিকারের স্বজন হারানোর বেদনায়, মহাবিজয়ের আনন্দ সর্বোপরি ঐক্য, ত্যাগ, সংগ্রাম ও অধিকার আদায়ের চেতনাসিক্ত এক অনন্যসাধারণ দিন। শ্রমজীবী মানুষের মানবিক অস্তিত্ব এবং অধিকার যখন হুমকির মুখে পতিত হয়, তখন তাকে রক্ষা বা প্রতিষ্ঠিত করার কর্মপন্থা নির্ধারণে মহান মে দিবস অব্যর্থ বিজয়ের আলোকবর্তিকারূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

এ ভূখণ্ডের শ্রমিক সমাজ কোনদিনই যথাযোগ্য মর্যাদায় মে দিবস উদযাপন করার ন্যায্য অধিকার পায়নি। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা-উত্তর এই বাংলার মাটিতে প্রথম মে দিবসের বিশাল শ্রমিক সমাবেশে দাঁড়িয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১ মে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করেন এবং সরকারিভাবে মে দিবস উদযাপনের নির্দেশ প্রদান করেন। তারপর ওই বছর ২২ মে বঙ্গাবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ আইএলও'র (আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা) সদস্যপদ লাভ করে। উলেখ্য, জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার সদস্যপদ লাভের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রথম কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ ও স্বীকৃতি লাভের গৌরব অর্জন করে। বঙ্গাবন্ধুর দীর্ঘ কর্মময় জীবনের মুল লক্ষ্যই ছিল সমাজের অনগ্রসর শ্রেণী, শোষিত তথা বাংলার গরিব-দুখী-অসহায় মানুষের মুক্তি।

যে কারণে তাকে আমরা দেখতে পাই ছাত্রাবস্থায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবি আদায়ের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে, মে দিবসকে সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং যথাযোগ্য সরকারি মর্যাদায় পালনের নির্দেশ দিতে, যুদ্ধবিধ্বস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে দেশের সব শিল্পকারখানাকে জাতীয়করণ করে চির অবহেলিত-শোষিত-বঞ্চিত শ্রমিক সমাজকে সরকারি কর্মচারীর মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে, উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের শুধু হুকুমের দাস নয় বরং অংশীদারিত্বের সুযোগ দিয়ে সম্মানিত ও গুরুত্বপুর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত করতে, বিশ্বের সর্বোচ্চ ফোরাম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে 'বিশ্ব আজ দু'ভাগে বিভক্ত, শাসক আর শোষিত; আমি শোষিতের পক্ষে'– এই দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জ উচ্চারণ করতে, দেশের

সর্বোচ্চ আইন-সংবিধান ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির মূলনীতি হিসেবে সমাজতন্ত্র তথা শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের অঙ্গীকারকে অঙ্গীভূত করতে, প্রতিক্রিয়াশীল ও লুটেরা পুঁজিপতি শক্তির কৃত্রিম সৌন্দর্যে মোহাবিষ্ট না হয়ে, মৃত্যুর হাতছানিকে আলিঙ্গান করে মানুষের জীবনের জয়গান গাইতে।

এত কিছুর পরও আমাদের চরম ব্যর্থতা- আমরা বঙ্গবন্ধুকে রক্ষার গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারিনি। '৭৫-এর ১৫ আগস্ট তাকে সপরিবারে নির্মমভাবে খুন করে এতিম করা হয়েছে এই বাংলার শ্রমজীবী ভুখা-নাঙ্গা মানুষকে। হত্যা করা হয়েছে এই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা তথা হাজার বছরের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেতনাকে। আজ বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তার পবিত্র রক্তে রাঙানো রাখিবন্ধনে আবদ্ধ শ্রমজীবী মানুষ আছেন, মহান মে দিবসের চেতনা ও শিক্ষা আছে, আরও আছে সব ধরনের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও লড়াই-সংগ্রাম করার জন্য বঙ্গবন্ধুর অবিনাশী বাণী, যা আমাদের প্রেরণার অফুরন্ত উৎস। তাই পারসন্স, স্পাইস, ফিসার, এনজেল, স্কোয়ার, ফিলডেন, লিংগেনিবসহ মহান মে'র শহীদদের মতোই বঙ্গবন্ধুর নাম শ্রমজীবী মানুষের মিছিলে অমর ও অক্ষয় হয়ে মিশে থাকবে।

আজকে সারাদেশে সুস্থ ও দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা শুধু সরকার বা বিনিয়োগকারীরাই নয়, শ্রমিক সমাজের পক্ষ থেকেও উপস্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু কিভাবে, কোন পথে সম্ভব, সে ব্যাপারে কারও মাথাব্যথা খুব একটা আছে বলে প্রতিভাত হচ্ছে না। কারণ ট্রেড ইউনিয়নকে সঠিক ধারায় ফিরিয়ে আনা তো মূল লক্ষ্য নয়, মূল খেলা এখানে- ট্রেড ইউনিয়নকে ধ্বংস করে শোষণের একটা অপচেষ্টা বা ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের পথ উন্মুক্ত করা। সুস্থ ট্রেড ইউনিয়নের কথা যারা বেশি বেশি বলেন, তারাই কিন্তু ইউনিয়নের অভ্যন্তরে সন্ত্রাস, অনৈক্য ও অসুস্থতার বীজ বপন করেছেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন। তা না হলে দল-মত নির্বিশেষে বাংলাদেশ মালিক পক্ষের এফবিসিসিআইয়ের মতো শ্রমিক পক্ষের একটি জাতীয় মঞ্চ বা কেন্দ্রের পরিবর্তে অর্ধশত ন্যাশনাল সেন্টারের আবির্ভাব হয় কিভাবে? এ প্রশ্নের জবাব এদেশের শ্রমিক নেতারা দেবেন, নাকি মালিক বা সরকার পক্ষ দেবে? আজ বোধহয় সময় এসেছে সব সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে স্থিতিশীল শ্রম পরিস্থিতি নিশ্চিত করে দেশের শিল্প উৎপাদন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্বার্থে 'রাজনীতি যার যার শ্রমিক সংগঠন এক আকার'- এ স্লোগানের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার।

'৭৫-এর পটপরিবর্তনের পর সামরিক স্বৈরাচারী সরকারগুলো ক্ষমতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে দল গঠন ও ভারি করার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকারখানা পানির দামে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করেছিল। আজ প্রায় ৩০ বছর পরও সেগুলো কিন্তু লাভজনক হয়নি- এমনকি শিল্পের বিক্রয় মূল্যও সরকারি তহবিলে জমা হয়নি। পক্ষান্তরে ওই শিল্প চালু বা উৎপাদনোপযোগী করার জন্য ব্যাংক থেকে শত শত কোটি টাকা ঋণ নিয়ে শান-শওকতের মতো অনুৎপাদনশীল খাতে অপচয় ও আত্মসাৎ করা হয়েছে। যদি এই ঋণের টাকা পরিকল্পিতভাবে শিল্পায়নে বিনিয়োগ হতো, তাহলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধিসহ শ্রমিক কল্যাণ তথা দারিদ্র্য বিমোচনের কাজ নিঃসন্দেহে এগিয়ে যেত। আজকে এই অপূরণীয় ক্ষতি কাদের দ্বারা, কিভাবে সাধিত হয়েছে তা সবাই জানে। তারপরও সব দোষ নন্দঘোষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়। ঢালাওভাবে বলা হয়, অসুস্থ শ্রমিক রাজনীতির কারণেই শিল্প খাতে বিনিয়োগের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না।

এর চেয়ে বড় মিথ্যাচার আর কী হতে পারে? কারণ যে দেশে গণতন্ত্রের উড়ন্ত কপোতকে বারবার বন্দুকের গুলি আর বোমা-বারুদ দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে, জনগণের অধিকার প্রয়োগের সুযোগ হরণ করা হয়েছে, মৌলিক মানবাধিকারকে বুটের তলায় পিষ্ট করা হয়েছে, ক্ষমতা দখল, ক্ষমতা রক্ষা ও ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য শ্রমিক সমাজকে লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, শিল্পায়নের নামে গৃহীত ঋণ অপচয় করা হয়েছে, যে দেশে কারণে-অকারণে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের চরিত্র হরণের জন্য প্রচার মাধ্যমে অপপ্রচার করা হয়- সেই দেশে সুস্থ, দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার দাবি কতটুকু যৌক্তিক? এ প্রশ্নের বস্তুনিষ্ঠ জবাব ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধীরাও দিতে পারবেন না বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। কারণ সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার জন্য যেমন সৎ, যোগ্য ও দক্ষ মালিক-শ্রমিক দরকার, তেমনি গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মৌলিক মানবাধিকার চর্চার পরিবেশও প্রয়োজন।

যতদুর জানা যায়, আজ থেকে ৩১৯ বছর আগে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে ঠেলাগাড়ির শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে ইউনিয়ন ধারণার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। তারপর থেকেই শ্রমজীবী মানুষ সংগঠিত শক্তি দিয়ে দেশে-বিদেশে বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে রক্ত দিয়ে শোষণের সব যুক্তিধারার ভিত্তিমূল উৎপাটন ও নস্যাৎ করে দিয়েছে। কিন্তু দেশে দেশে, সমাজে সমাজে আজও শোষণ ও শ্রমের মজুরি আত্মসাতের চূড়ান্ত অবসান হয়নি। বরং রাষ্ট্র তথা সমাজ ব্যবস্থার শিরা-উপশিরায় সেটি অব্যাহত আছে। তাই মানুষে মানুষে শোষণ যতদিন থাকবে, ততদিন মহান মে'র অঙ্গীকারের বাণী জাগ্রত থাকবে। মহান মে'র এই ঐতিহাসিক দিবসে আসুন আমরা সরকার, মালিক, শ্রমিকসহ সব পক্ষ সবার স্বার্থে অঙ্গীকারবদ্ধ হই একটি জনকল্যাণমুখী, মানবিক ও উৎপাদনমুখী শ্রম আইন প্রণয়ন করতে, অসৎ মালিক ও শ্রমিক উভয়কে প্রতিরোধের মাধ্যমে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্কের বিকাশ ঘটাতে, সভ্যতা বিনির্মাণের নিয়ামক শক্তি দেশের লাখো কোটি শ্রমিকের ভাত-কাপড়-শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও বিশ্রামের সুযোগ নিশ্চিত করতে, সর্বস্তরে মৌলিক মানবাধিকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র ও শান্তির অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে।

তাহলেই এই মহান মে দিবসের চেতনা এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের শোষণহীন ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সোনার বাংলা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার যে 'বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬' প্রণয়ন করেছিল, তা শ্রমজীবী মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও কল্যাণকে সুরক্ষা দিতে পারেনি। বিগত ২টি বছর সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ একটি অদ্ভুত ধরনের সরকার দেশের মানুষের শাসনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের পাশাপাশি শ্রমজীবী মানুষের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারও হরণ করে রেখেছিল। বিগত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী তার দল তথা মহাজোটের নির্বাচনী ইস্তেহারে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি সরকারে গেলে আইএলও কনভেনশন ও সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ও উৎপাদনমুখী শ্রম আইন প্রণয়ন করবেন। সেই কাজ এখন চলমান। দেশের শ্রমজীবী মানুষ দ্রুত বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহারের শুভ বাস্ত বায়নের অপেক্ষায় আছেন। আজকের এ দিনে আমরা কি আশা করতে পারি, খুব দ্রুত সেই প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হবে?

মোঃ ইসরাফিল আলম এমপি :সভাপতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

সাংবাদিকদের সম্মানে মিশনের ডিনারে রাষ্ট্রদুত ড. মোমেন

জাতিসংঘের ৬৫ কমিটিতে বাংলাদেশ : শান্তিরক্ষা মিশন থেকে বছরে আয় আড়াই হাজার কোটি টাকা

জাতিসংঘ থেকে এনা : জাতিসংঘের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী কমিটিসহ মোট ৬৫ কমিটিতে বাংলাদেশ নির্বাচিত হয়ে নীতি-নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। যার স্বীকৃতি হিসেবে আগের যে কোন সময়ের চেয়ে বর্তমানে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে। এ বছর থেকে আগামী ৪ বছরে প্রায় দুই বিলিয়ন ডলারের সহায়তা পাবে বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রয়োজনসংখ্যক মহিলা পুলিশ পাঠানোর একটি প্রস্তাবও রয়েছে বাংলাদেশের প্রতি। ২৫ এপ্রিল সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের মিলনায়তনে স্থানীয় মিডিয়ার সৌজন্যে দেয়া এক ডিনার পার্টিতে রাষ্ট্রদুত ড. এ কে এ মোমেন এসব তথ্য জানান।

মিশনের প্রেস মিনিস্টার হিসেবে যোগদানকারী মামুন-অর রশীদকে মিডিয়ার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া উপলক্ষে এ ডিনার পার্টিতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি মোস্তাফিজুর রহমান এবং কালচারাল মিনিস্টার অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন আহমদ। অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করেন প্রেস মিনিস্টার মামুন-অর রশীদ। এ সময় উপস্থিত সাংবাদিকদের একটি করে কলম ও বাংলাদেশ মিশনের লগো খচিত প্যাড প্রদান করা হয়। স্থায়ী প্রতিনিধি ড. মোমেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের সরব উপস্থিতির ক্ষেত্র তৈরীর ক্ষেত্রে মিডিয়ার অপরিসীম ভূমিকার প্রশংসা করেন

এবং আন্তরিকতাপূর্ণ সহায়তা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান। ড. মোমেন তার বক্তব্যের শুরুতেই বাংলাদেশের জন্যে একটি সুখবর দেন। সেটি হচ্ছে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে বাংলাদেশী আমিরা হকের নিয়োগ। এদিনই মহাসচিব বান কি-মুন এ নিয়োগ নির্দেশ জারী করেন। দীর্ঘ ৪০ বছর যাবত জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ পদে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনকারী আমিরা হকের এ পদোন্নতির জন্যে রাষ্ট্রদুত ড. মোমেন মহাসচিবের প্রতিও গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে ড. মোমেন বলেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ সর্বোচ্চসংখ্যক সেনাসদস্য অংশগ্রহণকারী দেশ। বিশ্বে ৬৫টি মিশনে মোট প্রায় এক লাখ শান্তিরক্ষীর মধ্যে বাংলাদেশের সৈন্য সংখ্যা ১০ হাজারের বেশি। ৪৫ মিশনে অংশগ্রহণকারী প্রতি ১০ জনে বাংলাদেশের একজন সৈনিক সক্রিয়। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের আয় গত তিন বছরে ৯শ' ১৭ মিলিয়ন ডলার বা ৭ হাজার ৫শ' কোটি টাকা। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পর সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ সেকেন্ড কমিটি (অর্থনীতি বিষয়ক) ও বিশ্ব শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের জন্য গঠিত পিস্ বিল্ডিং কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ। অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ ৬৫ কমিটির কো-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সদস্যপদে সক্রিয় রয়েছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যক্রমে বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন, তথ্য-প্রযুক্তির অগ্রগতি, আন্তর্জাতিক কর্মকান্ডে সরকারের বিপুল সাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোর 'রোল মডেল' হিসাবে কাজ করছে।

ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন সাংবাদিকদের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজের প্রারম্ভিক আনুষ্ঠানিকতায় শেখ হাসিনা সরকারের বর্তমান শাসনকালে জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকান্ডে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের কর্মতৎপরতার বিস্তারিত তথ্যচিত্র তুলে ধরেন।

মিশনের কর্মতৎপরতা নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় বিশেষভাবে স্থান পায়- জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের বিশেষ তৎপরতায় জাতিসংঘ মহাসচিব বান-কি-মুন সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করেছেন। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের কর্মকান্ড যথাযথভাবে উপস্থাপনের কারণেই বাংলাদেশ গত দু'বছর পর-পর দু'টি এওয়ার্ড-এমডিজি এওয়ার্ড ও সাউথ-সাউথ পুরস্কার লাভ করে। মিশনের বিশেষ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের বিচক্ষন নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সভাপতিত্বসহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশী সৈনিকদের কিভাবে প্রস্তুত করা হয় সে বিষয়ের উপর খুব শীঘ্রই জাতিসংঘ সদর দপ্তর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারী তৈরি করতে একটি বিশেষজ্ঞ দল বাংলাদেশে যাচ্ছে বলেও এ সময় উল্লেখ করা হয়।

মূল বক্তব্যে ড. এ.কে. আব্দুল মোমেন আরো বলেন, ২০০১-২০০৪ পর্যন্ত ৪ বছরে ১৮ হাজার ৯শ' ৭৭ জন সেনাসদস্য শান্তি মিশনে অংশ নেয়। ২০০৯ থেকে ২০১২ এই সাড়ে তিন বছরে ৪২ হাজার ২শ ৪৯ জন শান্তি রক্ষা মিশনে অংশ নেয়-যা পুর্ববর্তী চার বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। উল্লেখ্য, এই সময়েই সর্বপ্রথম বাংলাদেশী নারী সৈনিক ও পুলিশ শান্তি মিশনে অংশ নেয়। এদের সংখ্যা ৫শ'র কম নয়। ২০০১-২০০৪ সালে মাত্র ৪শ' ৯১ জন পুলিশ সদস্য শান্তিরক্ষা মিশনে ছিল। বর্তমানে তা ১৫ গুণ বেড়ে ৭ হাজার ৪শ' জনে উন্নীত হয়েছে। রাষ্ট্রদুত মনে করেন অধিকতর নারী সেনা ও পুলিশ সদস্য সরকার প্রেরণ করলে শান্তিরক্ষা মিশনে ঢুকাতে পারবেন। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, নানারকম প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে বাংলাদেশ এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে

বিশ্ব দরবারে রোল মডেল হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে বাংলাদেশ বিগত বছরগুলোতে জিডিপি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। নারী উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান, বেকারত্ব নিরসন, সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর প্রসারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি নিয়ে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা কাজ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদ সাংবাদিকদের কাছে প্রত্যাশার কথা বলতে গিয়ে বিবেকতাড়িত কণ্ঠে বলেন, একজন সাংবাদিক তার কলম রক্তে ডোবাবেন, নাকি কালিতে, নাকি পানিতে ডোবাবেন, সে দায়ভার একান্তই তার নিজের। সাংবাদিক হিসাবে সকলের কলম বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ের কথা নিঃশঙ্ক চিত্তে বলুক, পথ দেখাক, জাগরণ তৈরী করুক সেটাই আমাদের কামনা। সংবাদপত্রে লেখা একটি শব্দ যে কারো সাজানো জীবন তছনছ করে দিতে পারে, আবার একটি শব্দই একজন মানুষকে নতুন করে বেঁচে থাকতে উজ্জীবিত করতে পারে, পথ দেখাতে পারে। তাই বলব সাংবাদিকদের কলম আমাদের অর্জনের কথা বলুক। সমালোচনাও করুক, তবে তা যেন হয় বস্তুনিষ্ঠ। বস্তুনিষ্ঠতা মানুষের কাছে একজন সাংবাদিকের গ্রহণযোগ্যতাই বাড়িয়ে তুলবে। সামগ্রিকভাবে গড়ে তুলবে রুচিবোধ সমৃদ্ধ ও দায়িত্বশীল সমাজ-রাষ্ট্র।

নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক ফোরামে পুতুল

বাংলাদেশের জন্ম নিবন্ধন প্রক্রিয়া অটিজম চিহ্নিত করণে বিশেষ ভুমিকা পালন করছে

নিউইয়র্ক থেকে এনা : অটিজম বিষয়ক বাংলাদেশের জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারওম্যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল বলেছেন, বাংলাদেশে জন্ম নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালু হওয়ায় জন্মলগ্ন থেকে অটিজমের শিকার শিশুদের সংখ্যা জানা যাচ্ছে। অটিজম প্রতিরোধে বাংলাদেশের অগ্রগতি দৃষ্টান্তমূলক। মঙ্গালবার ২৪ এপ্রিল নিউইয়র্কের এক হোটেলে মধ্যাহ্নভোজপূর্ব এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। সৌদি প্রিন্সেস সামিরা এ বক্তব্য সমর্থন করেন। সায়মা ওয়াজেদ পুতুল শিশু অধিকার বিষয়ক ইউনিসেফের অপর এক আলোচনায়ও অংশ নেন।

বৈঠকে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, সৌদি আরবের প্রিন্সেস সামিরা, সৌদি রাষ্ট্রদুত আব্দুল্লাহ ইয়াহ এ এল মৌলিম, অটিজম বিশেষজ্ঞ মার্ক রথমেয়ার, ড. এন্ডি শীষ, জন কার্লোস ব্রান্ড, ড. এ রশিদ, সমাজকর্মী সেলিনা মোমেন প্রমুখ অংশ নেন।

অটিজম নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি তুলে ধরে জাতীয় অটিজম কমিটির চেয়ারওম্যান সায়মা পুতুল বলেন, 'আপনারা জানেন, অটিজম হল একটি ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্য সমস্যা। সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল (সি ডি সি) এর তথ্য অনুসারে আমেরিকাতে প্রতি ৮৮ জন শিশুর মধ্যে একজন অটিজমে আক্রান্ত। তবে এর মধ্যে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের আক্রান্তের হার অনেক বেশী। যেমন প্রতি ৫৪ জন ছেলের মধ্যে একজন এবং ২৫২ জন মেয়ের মধ্যে ১ জন অটিজমে আক্রান্ত- যা সম্মিলিতভাবে ডায়াবেটিস, এইডস, ক্যান্সার, সেরিব্রাল পলসি, সিস্টিক ফাইব্রোসিস, ডাউন সিনড্রোম এ আক্রান্ত শিশুদের তুলনায় অনেক বেশি।' পুতুল উল্লেখ করেন,'গ্লোবাল অটিজম পাবলিক হেলথ-বাংলাদেশে যা গ্যাপ হিসেবে পরিচিত-সেটি স্বউদ্যোগে পুরানো

বাধাগুলো অতিক্রম করে নতুনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এজন্য আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের জন্য আমি গ্যাপ বাংলাদেশের ন্যাশনাল এ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ার হিসেবে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

বর্তমানে গ্যাপ বাংলাদেশ প্যারেন্টস এবং প্রফেশনালদের সমন্বয়ে অ্যাওয়ারনেস এন্ড অ্যাডভোকেসি, এডুকেশন, সার্ভিস এবং রিসার্চ-এই চারটি টাস্কফোর্সের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। খুব শীঘ্রই ইন্টারমিনিস্টারিয়েল টাস্কফোর্স গেস ইন্টার অর্গানাইজেশনাল ইমপ্লিমেন্টেশন টাস্কফোর্স গঠনের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত সংগঠনের প্রতিনিধিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে গ্যাপ বাংলাদেশের কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারিত করা হবে বলেও উল্লেখ করেন সায়মা পুতুল।

তিনি বলেন, 'গ্যাপ বাংলাদেশ ইতোমধ্যে আমাদের টাস্কফোর্সের সদস্যগণের স্বতঃপ্রনোদিত সহায়তা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের সিচ্যুয়েশন এনালাইসিস ডকুমেন্ট তৈরি করেছি। এই ডকুমেন্টে অটিজম এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটিজ বিষয়ে আমাদের বর্তমানে সম্পদ কী আছে এবং কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা চিহ্নিত করেছি এবং এর সম্ভাব্য সমাধানের সুপারিশ করেছি। আমরা শিশুদের জন্য অটিজম স্পিকস থেকে প্রণীত কমিউনিটি টুলকিটের বাংলা অনুবাদ করেছি। এটি আমাদের প্যারেন্টস, টিচার এবং সার্ভিস প্রোভাইডার অর্থাৎ যারা এই জনগোষ্ঠীকে সেবা দিয়ে থাকেন তাদের জন্য একটি সহায়ক টুলস্ হিসেবে কাজ করবে।'

সায়মা পুতুল তার দীর্ঘ পর্যালোচনামূলক বক্তব্যে আরো উল্লেখ করেন, 'আমাদের আরো মনে রাখতে হবে এই শিশুদের পারিবারিক এবং সমাজ জীবনে সমভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। এজন্য পরিবার, বাড়ী এবং স্কুলে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। উন্নত সেবার মানদন্ড নির্ণয় এখন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সমাজসেবা সেক্টরসমূহের সঙ্গে পেশাজীবী, এ্যাডভোকেট এবং পরিবারের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এ বিষয়ে আমাদের কাজ করতে হবে।'

বাংলাদেশের অবস্থানের প্রশংসা করলেন বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী জন সাল্‌সটনের

নিউইয়র্ক থেকে এনা : বিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী রয়েল সোসাইটির সভাপতি প্রফেসর স্যার জন সাল্‌সটন ৩০ এপ্রিল জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্টদুত ড. এ.কে. আব্দুল মোমেনের সাথে তার দপ্তরে রিও প্লাস টুয়েন্টি (জরড়+২০) মহাসম্মেলনের প্রেক্ষিতে সাক্ষাৎ করেন। আসছে জুন মাসের ২০-২২ তারিখ ব্রাজিলের রিও শহরে ভবিষ্যতে কী ধরণের পৃথিবী আমরা চাই, কী ধরনের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্ববাসী চায়-তার উপরই এ সম্মেলন হচ্ছে। এতে বাংলাদেশের অবস্থান যেমন-দারিদ্র্য নিরসন, জলবায়ুর সহযোগী ব্যবস্থা, জনগণের ক্ষমতায়নে অঙ্গীকার-এগুলোর সাথে রয়েল সোসাইটি একাত্মতা ঘোষণা করেছে। প্রফেসর সাল্‌সটনের নেতৃত্বে রয়েল সোসাইটি নয়টি প্রস্তাব নিয়ে এসেছে যাতে এগুলো রিও প্লাস টুয়েন্টিতে আলোচিত হয়।

এগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে দারিদ্র নিরসন, দ্বিতীয়তঃ খাদ্যশস্য ও বিদ্যুতের নিশ্চয়তা ও অপচয় কমানো, তৃতীয়তঃ ফ্যামিলি প্ল্যানিং, শিক্ষার অগ্রগতি ইত্যাদি।

তার সাথে আরো উপস্থিত ছিলেন রয়েল সোসাইটির পলিসি এ্যাডভাইজার মেরি রাম্বসি। রাষ্ট্রদুতের সাথে আলোচনায় অংশ নেন মিশনের উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান।

৯১'র ২৯ এপ্রিলের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে নিহতদের স্মরণ করলেন নিউইয়র্কের সন্দ্বীপবাসী

নিউইয়র্ক থেকে এনা: ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে হতাহতদের গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করলেন নিউইয়র্কে বসবাসরত সন্দ্বীপবাসী। এ উপলক্ষে ২৯ এপ্রিল রাতে নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনে জাফরান রেস্টুরেন্টে সন্দ্বীপ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সন্দ্বীপ এসোসিয়েশনের সভাপতি নুরল আমিন এবং নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে আলোচনায় অংশ নেন এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম বাবুল এবং জিয়াউদ্দিন কানু, সেক্রেটারী আস্রাফউদ্দিন ও সাবেক সেক্রেটারী নজরুল ইসলাম প্রমুখ। সকলেই বলেন, ২১ বছর আগের সেই ভয়াবহ স্মৃতি আজো তাড়িয়ে ফিরছে উপকূলীয় লোকজনকে। স্বজন হারানোদের বুক ফাঁটা আর্তনাদে আজো সন্দ্বীপ এবং আশপাশের এলাকার বাতাস ভারী হয়ে যায়। বক্তারা সন্দ্বীপের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার মাধ্যমে যে কোন পরিস্থিতি থেকে এ দ্বীপের মানুষকে রক্ষায় এগিয়ে আসার জন্যে সরকারের প্রতি দাবি জানান সকলে।

হিলারী ঢাকায় যাবেন তাই-

নিউইয়র্ক থেকে এনা : যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিন্টন ঢাকায় যাবার কর্মসূচি চূড়ান্ত করার পরই বিএনপি, তারেক পরিষদ এবং বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে জোর লবিং শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি সবিস্তারে হিলারীকে অবহিত করার জন্যে দেন-দরবার চালানো হচ্ছে। ২৭ এপ্রিল নিউইয়র্কে এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে উপরোক্ত সংগঠনের অন্তত: ৪টি প্রতিনিধি দল সিনেট, কংগ্রেস এবং কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট অফিসে স্মারকলিপি দিয়েছে। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যুক্তরাষ্ট্র শাখার শীর্ষ ৫ কর্মকর্তা কংগ্রেসনাল বাংলাদেশ ককাসের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান যোসেফ ক্রাউলীর নিউইয়র্ক অফিসে গিয়ে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ভয়াবহ ঘটনাবলী অবহিত করেন। এ সময় তারা কংগ্রেসম্যানের মাধ্যমে হিলারী ক্লিন্টনকে জানাতে চান যে, হিন্দুরা নিগৃহিত হচ্ছে কিন্তু প্রশাসন কোন এ্যাকশন নিচ্ছে না দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে। ঢাকা সফরের সময় হিলারী যেন প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়টি অবহিত করেন। ঐক্য পরিষদের স্থানীয় নেতা নবেন্দু বিকাশ দত্ত, রতন বড়ুয়া, টমাস দুলু রায়, সুশীল সাহা, শিতাংশু গুহের সাথে ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতা এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী।

তারা কংগ্রেসম্যানের মাধ্যমে হিলারীকে আরো জানাতে চান যে, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করার গভীর এক ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্রের হুতা একাত্তরের পরাজিত শক্তি। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন অব্যাহত রাখার অনুরোধও জানায় প্রতিনিধি দলটি।

এম ইলিয়াস আলী গুম, প্রধান বিরোধী দল বিএনপির শীর্ষনেতাদের বিরুদ্ধে লাগাতার মামলা এবং বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের দমন-পীড়নের ঘটনাবলী সরাসরি হিলারী ক্লিন্টনকে অবহিত করার জন্যে তারেক পরিষদ আন্ত র্জাতিক কমিটির চেয়ারম্যান আকতার হোসেন বাদল ২৭ এপ্রিল কংগ্রেসনাল বাংলাদেশ ককাসের ডজনখানেক সদস্যের অফিসে যোগাযোগ করেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েও স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়ার আগেই হিলারীর সাথে সাক্ষাতের জন্য। একইদিন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল ক্যাপিটল হিলে সিনেট ফরেন রিলেশন্স কমিটির চেয়ারম্যানের অফিসে গিয়ে স্মারকলিপি দিয়েছেন। তারা বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি উল্লেখ করেছেন এবং তা সবিস্ত রে হিলারী ক্লিন্টনকে জানাতে অনুরোধ করেছেন। এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন শরাফত হোসেন বাবু, সাখাওয়াত হোসেন। নিউইয়র্কে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এক কর্মকর্তার কাছে বিএনপি আরেকটি স্মারকলিপি দিয়েছে এম ইলিয়াস আলী গুম হবার পরিপ্রেক্ষিতে। বেলাল মাহমুদ, জসীম ভূইয়ার নেতৃত্বে এ প্রতিনিধি দলটি এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে আরো অবহিত করেছে যে, সরকারের অপশাসনের প্রতিবাদ যারাই জানাচ্ছে তারাই রোষানলে পড়ছে। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের নাম-নিশানা নেই বলেও তারা অভিযোগ করেছেন।

বিএনপি, তারেক পরিষদ এবং যুবদলের এসব তৎপরতা প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে যুক্তরাষ্ট্র আ'লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান বার্তা সংস্থা এনাকে বলেন, বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে হিলারী ক্লিন্টনকে নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। তারা সবকিছুই খুব ভালোভাবে জানেন বলেই ঢাকায় যাচ্ছেন। ড. সিদ্দিক আরো বলেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিকৃত করে বিএনপি-জামাত জোটের লোকজন অনেক আগে থেকেই আন্তর্জাতিক মহলকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু বিশ্বটি এখন আর বিচ্ছিন্ন একটি দ্বিপ নয়। সকলেই সবকিছু জানেন অনেক সহজে। ড. সিদ্দিক বলেন, প্রকৃত সত্য হচ্ছে, একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার ঠেকাতে সংঘবদ্ধভাবে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বিপুল অর্থ ব্যয়ে। এসব অপচয়ে হিলারী ক্লিন্টন কিংবা ওবামা প্রশাসনকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব নয়। কারণ, একাত্তরের ঘাতকদের বিচার তারাও চাচ্ছেন।

সিনেটর ডারবিন বললেন

ইউনুস হতে যাচ্ছেন ইতিহাসের সপ্তম ভাগ্যবান ব্যক্তি

শিকাগো : ড. মুহম্মদ ইউনুসের সাথে সিনেটর ডিক ডারবিন । ছবি-এনা।

নিউইয়র্ক থেকে এনা : যুক্তরাষ্ট্র সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ডেমক্র্যাটিক পার্টির এ্যাসিস্ট্যান্ট লিডার সিনেটর ডিক ডারবিন বলেছেন, বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহম্মদ ইউনুস হতে যাচ্ছেন ইতিহাসের সপ্তম ভাগ্যবান ব্যক্তি-যিনি একইসাথে শান্তিতে নোবেল পুরষ্কার, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম এওয়ার্ড এবং কংগ্রেসনাল গোল্ড মেডেল পাচ্ছেন। শিকাগোতে ৩ দিনব্যাপী 'শান্তিতে নোবেল পুরষ্কারপ্রাপ্তদের দ্বাদশ সম্মেলন'-এ যোগদানকালে গত বুধবার ড. মুহম্মদ ইউনুসের সাথে সাক্ষাত করে ইলিনয় থেকে নির্বাচিত ইউএস সিনেটর ডিক ডারবিন উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। এ সময় সিনেটর ডিক ডারবিন বুকে জড়িয়ে ধরেন ড. ইউনুসকে। উলেখ্য যে, সিনেটর ডারবিন সিনেটে (সিভিল রাইটস, মানবাধিকার, সংবিধান বিষয়ক) জুডিশিয়ারি সাব কমিটিরও চেয়ারম্যান। ডিক ডারবিন বলেন, বাংলাদেশের গরিবের চেয়েও গরিব মানুষগুলোকে বেঁচে থাকার পথ দেখিয়েছেন ড. মুহম্মদ ইউনুস। ড. ইউনুসের দারিদ্রবিমোচনের কার্যক্রম আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। ড. ইউনুসের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইমেজ আজ সারাবিশ্বে উজ্জল হয়ে উঠেছে। সিনেটরের মুখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় অভিভূত ড. ইউনুস এ সময় কেবলই বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান ডিক ডারবিনকে।

জানা গেছে, শান্তিতে নোবেল পুরষ্কারসহ উপরোক্ত ৩টি পুরস্কার প্রাপ্ত ৬ ভাগ্যবান মানুষের মধ্যে রয়েছেন মার্টিক লুথার কিং এবং নরম্যান আর্নেস্ট বরলোগ। ড. মুহম্মদ ইউনুসকেও কংগ্রেসনাল গোল্ড মেডেল প্রদানের বিল পাশ হ ছে গত বছর। সেটি এ বছরই বিতরণ করা হবে। এর আগে প্রেসিডেন্ট বরাক ওবামার কাছ থেকেই ড. ইউনুস গ্রহণ করেছেন প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম এওয়ার্ড।

ড. মুহম্মদ ইউনুস সম্পর্কে সিনেটর ডারবিনের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশীদের অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে, য. ইউনুসের আন্তর্জাতিক ইমেজকে বাংলাদেশের সার্বিক কল্যাণে ব্যবহার করা উচিত। আর এটি হতে পারে ড. ইউনুসকে সরকারের বিশেষ দুত নিয়োগের মাধ্যমে। প্রসঙ্গাত: উলেখ্য যে, ২০০৯ সালেল ১২ আগস্ট হোয়াইট হাউজে ওবামার কাছ থেকে 'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম' গ্রহণের পরই হোয়াইট হাউজ প্রাঙ্গানে নিজের অনুভূতি ব্যক্তকালে বার্তা সংস্থা এনার কাছে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের কল্যাণে যে কোন দায়িত্ব আমি গ্রহণ করতে দ্বিধা করবো না। কারণ, আমি সর্বান্তকরণেই বাংলাদেশের কল্যাণ চাই।'

ভারতের নদী সংযোগ প্রকল্প বাতিল দাবিতে
২৫ মে জাতিসংঘের সামনে মানববন্ধন

নিউইয়র্ক থেকে এনা : ভারতীয় নদী সংযোগ প্রকল্প প্রতিহত করা সম্ভব না হলে সামনের ৫০ বছরের মধ্যে উত্তর বঙ্গা মরুভূমিতে এবং দক্ষিণ বঙ্গের বিস্তির্ণ জনপদ সাগরে মিশে যাবে। এ আশংকা করে ২৫ মে বেলা আড়াইটা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরের সামনে মানববন্ধনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন)। বিভিন্ন দেশে পেশাজীবী বাংলাদেশীদের সমন্বয়ে গঠিত বেনের উদ্যোগে নেয়া এ কর্মসূচির সাথে প্রবাসীদের সম্পৃক্ত করার অভিপ্রায়ে নিউইয়র্ক সিটিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৬ এপ্রিল। সেখানে কম্যুনিটির প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন। সে সময় বেনের গোবাল সমন্বয়কারী ড. নজরুল ইসলাম সার্বিক পরিস্থিতি উপস্থাপন করে বলেন, প্রায় ১৫ হাজার কোটি ডলার ব্যয়ে ঐ নদী সংযোগ প্রকল্পের কাজ শুরুর নির্দেশ দিয়েছে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট গত ২৭ ফেব্রুয়ারি। কাজ শেষ করতে হবে ২০১৬ সালের মধ্যে এবং এ প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে সুপ্রিম কোর্ট একটি কমিটিও গঠন করে দিয়েছে। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের এ নির্দেশ বাংলাদেশের মৃত্যু পরোয়ানার সামিল বলে উলেখ করেন ড. ইসলাম।

তিনি বলেন, এ প্রকল্পের মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং গঙ্গা নদী থেকে পানি পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের দিকে অপসারণ করা। ফারাক্কা বাঁধ দ্বারা গঙ্গার পানি অপসারণের পর এখন ব্রহ্মপুত্র নদ শুষ্ক মওসুমে বাংলাদেশের নদ-নদীর ৭০% পানির উৎস। এ অবস্থায় এ দুটি নদ-নদীর পানিও সরিয়ে নেয়া হলে বাংলাদেশের অবশিষ্ট নদীগুলো দ্রুত মৃত্যুমুখে পতিত হবে বলে মন্তব্য করেন বেনের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী সৈয়দ ফজলুর

রহমান। তিনি বলেন, ভারতের এহেন আচরণ নদী সংক্রান্ত জাতিসংঘ ১৯৯৭ সনের কনভেনশনের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। এ সভা থেকে আরো জানানো হয়, জাতিসংঘের সামনে মানববন্ধনের পর মহাসচিব বরাবরে একটি স্মারকলিপি এবং একইসাথে ভারতীয় স্থায়ী প্রতিনিধিকেও স্মারিকলিপি দেয়া হবে। মতবিনিময়ে আরো অংশ নেন বেনের কর্মকর্তা ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ। এ সময় বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম অঙ্গিকার করেন যে, কর্মসূচি সফল করতে তারা যথাসাধ্য সহায়তা দিয়ে যাবেন। তিনি কম্যুনিটির সকলকে নিজ নিজ উদ্যোগে এ কর্মসূচিতে অংশ নেয়ার অনুরোধ জানান।

‘গুড সিটিজেন’ এওয়ার্ড পেলেন লেখক সাংবাদিক শিব্বীর আহমেদ

নিউইয়র্ক থেকে এনা : কম্যুনিটিকে সুসংগঠিত করে আমেরিকান স্বপ্ন পূরণের পথে ধাবিতে করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাবার স্বীকৃতি হিসেবে ওয়াশিংটন ডিসি এলাকায় বসবাসরত প্রবাসী লেখক, সাংবাদিক শিব্বীর আহমেদকে ‘গুড সিটিজেন’ এওয়ার্ড প্রদান করলো বৃহত্তর ওয়াশিংটনের বিখাত সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলী’। গত ২১ এপ্রিল শনিবার ভার্জিনিয়ার ম্যাশন ডিষ্ট্রিক্ট পার্কে ‘ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলী’ আয়োজিত বাংলা বর্ষবরণের বর্ণাঢ্য উৎসবে এই সম্মাননা এওয়ার্ড হস্তান্তর করেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদুত আকরামুল কাদের।

উল্লেখ্য, লেখক সাংবাদিক শিব্বীর আহমেদ তার সম্পাদনায় প্রকাশিত ওয়েবসাইট পত্রিকা ‘খবর ডট কম’ এর মাধ্যমে ওয়াশিংটন, ভার্জিনিয়া, মেরিল্যান্ডে বসবাসরত বাংলাদেশী কম্যুনিটির চেহারা বদলে দিতে শুরু করেন। সেই থেকে ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করে এখানকার কম্যুনিটি। নুতন ভাবে নিজেদেরকে আবিস্কার করেন সকলে।

ব্যক্তিগতভাবে শিব্বীর আহমেদ আইটি বিশেষজ্ঞ। ১৯৯৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় ম্যানেজমেন্টে মাষ্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর ডিভি লটারী জিতে আমেরিকায় আসার পর ২০০১ সালে মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের সেন্ট থমাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাষ্টার্স করেন এবং বর্তমানে তিনি ওয়াশিংটন ডিসিতে আইটি ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কর্মরত আছেন। এ পেশার পাশাপাশি তিনি কম্যুনিটির উন্নয়ন-অগ্রগতির সাথেও নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন।

ফারজানা আক্‌কি খানের ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ

হাকিকুল ইসলাম খোকনঃ শিশু সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন শিরি শিশু সাহিত্য কেন্দ্রে নিউইর্য়ক শাখার অন্যতম কার্যকরী সদস্য ফারজানা আক্‌কি খান সম্প্রতি ক্রিমিন্যাল সাইকোলজীর ওপর ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেছেন। বাংলাদেশের সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার নিবাসী তথা বর্তমানে নিউইর্য়কের এস্টোরিয়ার স্থায়ীভাবে বসবাসবাসকারী ফারুক খান ও আনোয়ারা খানের কন্যা ফারজানা খান আকিকি পাবলিক স্কুলের শিক্ষকতা ছাড়াও সাইকাটিরিস্ট হিসেব সুপরিচিতি লাভ করেছেন।খবর বাপসনিউজ

শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতায় সম্প্রতি অর্জিত পি এইচ ডি ডিগ্রী ব্যাতিরেকে ড. ফারজানা খান আকিক ইতোর্পুবে নিউইর্য়ক ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স এবং লাইফ কোর্স করেছেন। ড. ফারজানা খান আকিকি মুলধারা ও অভিবাসী শিশু-কিশোরদেরর জন্যে ইংরেজীতে তিনটি বইয়ের রচয়িতা। এগুলো-- হলো “ইয়েপপি,--- ইটঁস রামাদান”,‘ইয়েপপি! রামাদান ইজ ওভার , ইঁটস ঈদ ’এবং“ স্কুল হোম কম্যুনিকেশন এন্ড রিডিং এচিভমেন্ট ইন কিন্ডারগার্ডেন স্কুল’। বইগুলো সর্ম্পকে নিউইর্য়কের স্কুল লাইব্রেরী জার্নালে উলেখিত হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ড.

ফারজানা খান আককির রয়েছে দশ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা। শিক্ষা সর্ম্পকিত বিবিধ বিষয়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে মুলধারার রেডিও টক শো ও টেলিভিশনে অংশগ্রহণ করেছেন।

একমাত্র কন্যা সন্তান আলীনা আহমদের জননী ফারজানা খান আক্কির ডক্টরেট ডিগ্রী প্রাপ্তিতে তাকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়েছেন শিরি শিশু সাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা শিশু সাহিত্যিক হাসানুর রহমান, শিরি'র অন্যতম উপদেষ্টা সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন ও শিরির নিউইর্য়ক শাখার মুখ্য পরিচালক পারভীন রহমান। বস্টন থেকে লেখক তরুন বড়ুয়া ড. ফারজানা খান আক্ককিে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, ড. ফারজানা খান আককি দেশ এবং বিদেশের শিশু মননশীলতাকে অনেক গভীরে নিয়ে যাবেন। বাপসনিউজ.

-হাকিকুল ইসলাম খোকন

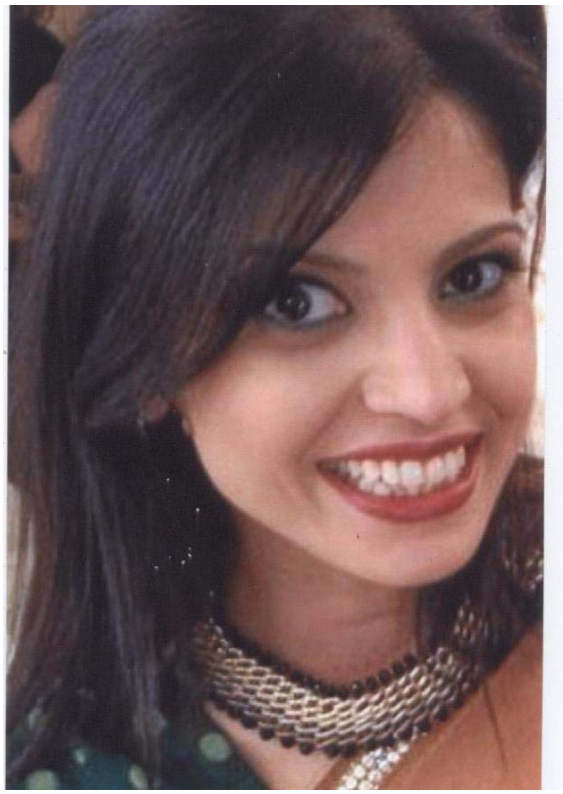

শিশু সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন শিরি শিশু সাহিত্য কেন্দ্রে নিউইর্য়ক শাখার অন্যতম কার্যকরী সদস্য ফারজানা আক্কি খান সম্প্রতি ক্রিমিন্যাল সাইকোলজীর ওপর ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেছেন।

রিয়াদে বর্ণিল আয়োজনে বাঙলা বর্ষবরণ

সউদী আরবের পরিবেশগত হাজারো সীমাবদ্ধতার মাঝেও সউদী আরবে বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদুত মু. শহীদুল ইসলাম গত ১৯ এপ্রিল ২০১২ নিজ বাসভবনে আয়োজন করেছিলেন বাঙলা বর্ষবরণের বর্ণিল এক চমৎকার আয়োজন। যেখানে বাঙালি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ৮/১০টি দেশের রাষ্ট্রদুত এবং তাঁদের মিসেস গন। মি. এবং মিসেস শহীদুল ইসলাম সবাইকে বাঙলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এসো হে বৈশাখ এসো এসো... গানটি মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করে রিয়াদের এক ঝাঁক শিল্পী কলাকুশলী।

মি. এবং মিসেস শহীদুল ইসলাম উপস্থিত অতিথিদের এবং সউদী প্রবাসী সকল বাঙালিদের বাঙলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন–একাত্তরে যেমন আমরা একত্রিত হয়েছিলাম দেশকে স্বাধীন করার জন্য, তেমনি আজকের এই বাঙলা নববর্ষের প্রথম দিনে আসুন আমরা শপথ করি আমরা দেশমাতৃকাকে বিশ্বে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে আবার এক কাতারে দাঁড়াই।

বিদেশী অতিথিগন ছিলেন বিধায় অনুষ্ঠানটি উপস্থাপিত হয় বাংলা এবং ইংরেজীতে। উভয় ভাষায় উপস্থাকের উচ্চারণ শৈলী অত্যন্ত নিখুত হওয়াতে অনুষ্ঠানটির এতে বিশেষ মাত্রা যোগ হয়েছে। শিশু শিল্পী দুজন তাদের দেশীয় নৃত্যে বাঙলার আবহমান সংস্কৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করে। বিদেশী ডিপ্লোমেটগন ক্ষণিকের জন্য হলেও সেদিন বাঙালি হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা প্রাণখুলে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

বিদেশী অতিথিগন মঞ্চে সারিবদ্ধভাবে বসে বাঙালি কমিউনিটিকে জানান দিয়ে গেলেন– হ্যাঁ আমরাও তোমাদের বাঙলা বর্ষরণে তোমাদের সঙ্গে একমোহনায় মিশে স্বাগত জানিয়ে গেলাম। তোমাদের কালচার এতটা রিচ্ আমাদের তা জানা ছিলোনা.. আজ জেনে পরিতৃপ্ত হয়ে তোমাদের ও জানাই শুভ নববর্ষ।

অনুষ্ঠান চলাকালীন মান্যবর রাষ্ট্রদুত মু. শহীদুল ইসলাম বিদেশী অতিথিদের এবং বাঙালি কমিউনিটির অতিথিদেও ঘুরে ঘুরে খোঁজ খবর নিচ্ছেন।

বর্ণিল সাজে সাজানো অনুষ্ঠান স্থল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও তাদের পরিবার পরিজন

অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও দুতাবাস কর্মকর্তাগন

অনুষ্ঠানের এক ঝাঁক শিল্পী কলাকুশলীদের পারফরমেন্স ছিলো চমৎকার। তাদের গানের ফাঁকে এই শিশু নৃত্যশিলী তার নৃত্য পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের আপ্পায়নের দায়িত্বে ছিলো রিয়াদ প্যালেস হোটেল ক্যাটারিং সার্ভিস। অতিথিদের হৃদয় আনন্দে ভরে দিতে অনুষ্ঠানে ছিলো র‍্যাফেল ড্র। অনেকেই অনুষ্ঠানে পুরস্কার পেয়ে আনন্দের তরঙ্গে তরাঙ্গায়িত হন। রাত প্রায় বারোটা পর্যন্ত চলতে থাকে বর্ষবরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।